॥ প্র থ ম অ ধ্যা য় ॥

সেকালের সংস্কৃত-শিক্ষা ও মধুসূদন

১. <u>মধুসূদনের আবির্ভাবের প্রাক্কালে সংস্কৃত ইংরেজি ও বাংলাশিক্ষা</u> :

মধুসূদনের সাহিত্য দিয়েই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত হল। আমাদের দীর্ঘকালপ্রবাহিত সাহিত্যধারা যে সমাজ এবং সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট ছিল, তার পরিবর্তন হল উনিশ শতকে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির সেই প্রাচীন প্রকৃতিটি পরিবর্তিত হল এবং সেখানে এল নতুন শিক্ষাদর্শ এবং সম্পূর্ণ নতুন এক বিদেশি ভাষা ও সাহিত্য। এই নতুন সংস্কৃতির দ্বারাই আধুনিক সাহিত্য পুষ্টিলাভ করেছে। এর প্রাণরস ধারা ছিল ত্রিপথগামী — বাংলা সংস্কৃত এবং ইংরেজি। মধুসূদন পরবর্তী কালে অনেকগুলি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রথম প্রেরণা এসেছিল এই তিন ভাষা থেকেই। বাংলায় কাশীরাম কৃত্তিবাসের কাব্য, ইংরেজিতে সেক্সপীয়র মিলটনের সাহিত্য এবং সংস্কৃতে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস প্রভৃতির কাব্য নাটক। তখন দেশে এই তিনটি ভাষার চর্চাই আমাদের শিক্ষালয়ে প্রচলিত।

মধুসূদন যখন গ্রামের পাঠশালা ছেড়ে কলকাতায় শিক্ষালাভের জন্য এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন (১৮৩৭) তখন দেশে ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা কিরকম ছিল, সংস্কৃত ফার্সী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষার চর্চাই বা কতটা ছিল, সে-বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান প্রয়োজন। একথা ঠিক যে জীবিকার জন্য বাঙালী তখন ইংরেজি ভাষা শিখতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া ঐ ভাষার মাধ্যমে যুগোপযোগী পাশ্চাত্য বিদ্যা অর্জনের তাগিদ এসেছে বাস্তব কারণেই। একদিকে যেমন দেশ ও বিদেশের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ দেখা দিয়েছে তেমনি পশ্চিমের উন্নততর জাতিগুলির সাফল্য ও দক্ষতার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যও তাদের ভাষাকে অধিগত করবার আকাঙ্ক্ষা ভারতীয়দের মনে অঙ্কুরিত হয়েছে। কেবল প্রাচীনকে নিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে না, যুগ-মন

নিয়ে আধুনিক বিদ্যাকে অধিগত করলেই জাতি হিসাবে আমরাও বিশ্বের জাতিগুলির পাশে আসন পেতে পারব এই ধারণাতেই রামমোহন রায়ও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে একখানি পত্র লিখে কেবল প্রাচ্যবিদ্যাসমূহ আয়ত্ত করার ব্যবস্থা না করে যাতে ভারতীয়রা ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্ত করে উন্নত জাতিগুলির সমকক্ষ হতে পারে সে ব্যবস্থা করার আবেদন করেছিলেন। সে শিক্ষার মাধ্যম যে ইংরাজি ভাষাই হতে হবে তেমন স্পষ্ট উল্লেখ অবশ্য সে-পত্রে ছিল না।[১]

ব্যবহারিক প্রয়োজনের ফলেই দেশীয় জনসাধারণের মনে পাশ্চাত্যবিদ্যার ও ভাষার প্রতি আগ্রহ জেগেছিল। এ বিষয়ে সুশীলকুমার দের উক্তি উদ্ধারযোগ্য।

In his struggle for existence the modern man is forced to pay more attention to what is called useful knowledge, and if he is not exactly contemptuous, he is certainly indifferent to the apparently fruitless learning of the bygone age.[২]

এ কারণেই দেশে সরকারী ভাবে ইংরাজি শিক্ষা প্রবর্তন হবার (১৮৩৫) বেশ কয়েক বৎসর আগেই কলকাতার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির আগ্রহ ও চেষ্টায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় (২০ জানুয়ারী, ১৮১৭) এবং রিচার্ডসন ডিরোজিওর মত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সেখানে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা করে যে নব্যবংশীয় যুবকশ্রেণীর উদ্ভব হল, তারা দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার সব কিছুকেই অবজ্ঞা করতে সুরু করল। নব উন্মাদনায় পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ

---

১. যোগেশচন্দ্র বাগল, 'শতবর্ষ পূর্বে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা' Krishnagar College Centinary Commemoration Volume, 1948, p. 59

২. Dr. S. K. De, The Place of Oriental Studies in our Educational System, উক্ত গ্রন্থ, পৃ. 41

ও অনুসরণের কুফলও যা ঘটার, তাই দেখা দিল।

It was also not properly understood and it is not properly understood even to day, that oriental studies furnish to us the key to the deeper understanding of our ways of life, of our manners and morals, in fact of ourselves. It is for this imperfect understanding that in our eagerness for the new learning we failed to do justice to what was great and good in our ancient learning, and as a result, oriental studies were never assigned their proper place in our system of education, which had become markedly alien in character and outlook from the very outset.[৩]

সংস্কৃত শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল না, তা নয়। কিন্তু, তার মান তেমন উঁচু ছিল না এবং সুযোগ্যবিদের তার পরিমাণ তেমন ছিল না। Sanskrit Commission এর Report থেকেও কথারই সমর্থন মেলে —

The available records are very meagre with regard to the character and extent of Sanskrit education existing at that time of the British advent which brought in the testimony of the early missionaries as well as that of young Indians who were inspired by a somewhat blind zeal for their newly acquired knowledge of western literature, is generally too sweeping and prejudiced.[৪]

Ward এর History, Literature, Manners etc. of the Hindoos

---

৩. Dr. S. K. De, পূর্বোক্ত, পৃ. 45

৪. Report of the Sanskrit Commission, 1956-57, p. 12

গ্রন্থেও সংস্কৃত শিক্ষার তেমন মান বা প্রসারের কথা বলেন নি ।

বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষানীতিতে সংস্কৃত বা দেশীয় ভাষাসমূহ কতটা স্বীকৃতি পেয়েছিল -- সে আলোচনাও অবান্তর নয় । ইংরেজেরা যখন বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে তখন এদেশের শিক্ষার ভার গ্রহণ করার ইচ্ছা তাদের ছিল মনে হয় না , ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণেই বেশি আগ্রহী ছিল । তবু চার্লস গ্রান্ট, লর্ড ওয়েলেসলি বা লর্ড মিন্টোর মত গভর্নরেরা নীতিগতভাবে সে দায় এড়িয়ে যেতে পারেন নি । প্রথম দিকে তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যার ওপরেই জোর দিতে চেয়েছিলেন , কারণ ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী নির্বিরোধে তাঁদের শাসন মেনে নিতে নাও পারেন । তাছাড়া আদালতের কাজের জন্য সংস্কৃত বা ফার্সী জানা এবং দেশীয় ন্যায়শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি প্রয়োজন। একারণেই ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কাশীতে সংস্কৃত কলেজ এবং ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন । ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত কোম্পানীর সনদ অনুযায়ী সরকার শিক্ষাখাতে প্রতিবৎসর এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেন । এর দ্বারা সংস্কৃত ও আরবি বই ছাপা ও ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের অনুবাদের কাজ হত, কিন্তু সে সব বই কিছুমাত্র প্রচার লাভ করে নি । শোনা যায় একখানি বইয়ের আরবি অনুবাদের জন্য বত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হয় এবং সে অনুবাদ নিতান্ত দুর্বোধ্য হওয়াতে সেই অনুবাদককেই আবার মোটা মাইনে দিয়ে বুঝিয়ে দেবার জন্য নিযুক্ত করা হয় । সরকারি অর্থ প্রায় সবটাই অপব্যয় হল । প্রাচ্যভাষাশিক্ষার কিছুই উন্নতি হয় নি ।

অথচ ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় যে স্কুল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয় সেখানে বালকেরা প্রথমে কিছু বাংলা শিখে তারপরে ইংরেজিতে পড়াশোনা করত । সোসাইটির অধীনে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ১১৫টি স্কুলে ৩৮২৮টি ছাত্র ছিল আর স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭ খ্রী· প্রতিষ্ঠিত) বাংলা ছাড়াও ইংরেজি বই প্রকাশ করত । সুশীল কুমার দে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ১৮৩৪-১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের এক বছরে যেকালে স্কুল বুক সোসাইটির সাড়ে একত্রিশ হাজার ইংরেজি বই বিক্রি হয়েছিল , সেখানে আরবি ও সংস্কৃত বই বিক্রি হয়েছিল মাত্র বাহান্নখানি । এর থেকেই বোঝা যায়

সাধারণের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আগ্রহ কত বেশি ছিল আর শিক্ষা দেশের মর্মমূল থেকে হয়ে পড়ছিল বিচ্ছিন্ন ।

তবু সংস্কৃত শিক্ষার ধারাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে — ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ও মাদ্রাসা পুনর্গঠনের কথা হয় । রামমোহন রায়ের আপত্তি সত্ত্বেও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল (১৮২৪ খ্রী) এবং মাদ্রাসাও পুনর্গঠিত হল, দিল্লি আগ্রাতেও প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপিত হ'ল । সরকারের বরাদ্দ অর্থের বেশির ভাগই প্রাচ্যবিদ্যার জন্য ব্যয় হতে থাকল, কিন্তু ইংরেজি স্কুলগুলি বেসরকারি প্রচেষ্টায় চলল এগিয়ে ।

সংস্কৃত কলেজ হিন্দু কলেজের পাশেই স্থাপিত হল এবং সেখানে কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার সুউচ্চ মান বজায় রাখা হল । সেখানে কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, জ্যোতিষ শাস্ত্র, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত সবই পড়ানো হত । বিদ্যাসাগরের শিক্ষার বিবরণ থেকেই বোঝা যায় কত দীর্ঘ সাধনায় ঐ কলেজের অধীতব্য বস্তু তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়েছে । দীর্ঘ সাড়ে বারো বৎসর (১ জুন, ১৮২৯ খ্রী. থেকে) অধ্যয়নের পরে তিনি কলেজের প্রশংসাপত্র পান (৪ ডিসেম্বর, ১৮৪১ খ্রী)। গঙ্গাধর শিরোমণি, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, নিমাইচরণ শিরোমণি প্রভৃতি খ্যাতিমান পণ্ডিতেরা সেখানে অধ্যাপনা করতেন । প্রাচ্যবিদ্যার কেন্দ্রগুলিতেও ক্রমে ইংরেজি পঠন পাঠন আরম্ভ হয় । সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত থাকার সময়ে বিদ্যাসাগর স্বয়ং সে কলেজে ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত রাখার জন্য বহু সংগ্রাম করেছিলেন — সে ইতিহাস আরও পরের ।

সংস্কৃত কলেজের মত প্রাচ্যবিদ্যার কেন্দ্র না হলেও কলকাতা সন্নিহিত বিশপস্ কলেজেও সংস্কৃত ভালই পড়া হত ; মধুসূদনের সংস্কৃতচর্চা প্রসঙ্গে আমরা তার বিস্তৃত আলোচনা করব । এছাড়া বিভিন্ন জেলায় সংস্কৃত শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে অ্যাডামের Second Report on the state of Education in Bengal (1836) থেকে জানা যায় । ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজশাহী জেলায় সংস্কৃত শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন —

The youths who commence the study of Sanscrit are expected to have acquired either at home or in a Bengali School merely a knowledge of Bengali writing and reading and a very slight acquirement with the first rules of arithmetic, viz addition and subtraction without a knowledge of their application. Hence learned Hindus having entered with these superficial acquirements and at an early age on the study of Sanscrit, and having devoted themselves almost inclusively to its literature, are ignorant of almost every thing else.

The studies embraced in a full course of instruction in general literature and grammar, lexicology, poetry and drama and rhetoric, the chief object of the whole being the knowledge of language as an instrument for the communication of ideas.[4]

দেখা যাচ্ছে কিছু ভাষাশিক্ষার উপরে জোর দেওয়ায় এই শিক্ষার একদেশ-দর্শিতার দিকটি অ্যাডামের নজর এড়ায় নি। পুস্তকের Table III তে তিনি ছাত্রসংখ্যা পাঠ্যবিষয় ইত্যাদির শ্রেণীভিত্তিক পরিসংখ্যান দিয়েছেন। এই স্কুলগুলিতে কি কি ধরণের বিষয় পড়া হত তার বিস্তৃত বিবরণ একথাই প্রমাণ করে যে কালের অনুপযোগী মানব জীবনের প্রয়োজন ও মুক্ত-চিন্তার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে নিতান্ত প্রাচীন পদ্ধতিতে সংস্কৃত চর্চা করার ফলেই এ শিক্ষা বর্তমান জগতে নিষ্ফল হয়েছে — সংস্কৃত শিক্ষার অপূর্ব মূল্যবত্তা ক্ষয়ে এসেছে।

---

4. William Adam, Reports on the state of Education in Bengal 1835 & 1838, Edited by Ananthnath Basu, University of Calcutta, 1941, p. 176.

অ্যাডাম তাঁর দ্বিতীয় শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্টে বলেছেন, টোলে প্রবেশ করেই শিক্ষার্থীকে পড়তে হত ব্যাকরণ। ব্যাকরণের সঙ্গে সঙ্গে অভিধান - যাতে শব্দার্থ এবং প্রতিশব্দ শিখতে হয়। এর জন্য ছিল রঘুনাথ চক্রবর্তীর টীকায় অমরকোষ। অন্যান্য বিষয় ছিল অলংকার (ছন্দোমঞ্জরী এবং কাব্যপ্রকাশ)।

তার পর অনেকের চতুষ্পাঠী হচ্ছে বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র এবং আয়ুর্বেদ পড়ানোর জন্য। রাজশাহী জেলায় বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হলেও ব্যাকরণ পাঠ এবং অমরকোষ মুখস্থ করবার প্রবণতাই অ্যাডাম বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন।[6]

In a general view of the state of Hindu learning in this district (রাজশাহী) Grammar appears to be the only department of study in which a considerable number of persons have a distinguished proficiency.[7]

ক্লাসিকেল বিদ্যাকে পঠনপাঠনচর্চা থেকে মুক্ত করে তাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়া হয়নি বলেই সুশীলকুমার যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

... from the last century upto the present time, the revived study of Sanskrit, Arabic and Persian have not borne such fruit as might be expected from a century's uninterrupted cultivation.[8]

---

৬. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অমরকোষের এই সমাদরের অন্য প্রমাণও আছে। তৎকালীন সংবাদ পত্রে অমরকোষ পুনর্মুদ্রণ হবার বিজ্ঞাপন অনেকবার বেরিয়েছে। দ্রষ্টব্য, সংবাদ পত্রে সেকালের কথা। মধুসূদনও যে অমরকোষ ব্যবহার করতেন তার প্রমাণ আছে।

৭. Adam's Report, p. 182

৮. Dr. S. K. De. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ 42

যদিও শিক্ষাখাতে সরকারের বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশই প্রাচ্যবিদ্যার প্রসার-চেষ্টায় ব্যয়িত হয়ে আসছিল, তবু সে ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা কমিটির সদস্যদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় — প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থক Orientalist ও ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী Anglicist দের বিবাদ চরমে ওঠায় শেষ পর্যন্ত Committee of Public Instruction- এর সভাপতি টমাস বেবিংটন মেকলে বড়লাট বেন্টিঙ্কের কাছে তাঁর যে রিপোর্ট পাঠালেন তাতে ইংরেজি শিক্ষার প্রতিই সমর্থন ছিল। তিনি এও জানিয়েছিলেন যে যদিও বৃত্তিদান ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে তবু ভারতবাসীদের মধ্যে ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা ইংরেজি ভাষাকেও অনেকাংশে আয়ত্ত করে নিয়েছে। এ ছাড়া তাঁর মত অনুসারে — English is better worth knowing than Sanskrit and Arabic। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল — এরপর থেকে শিক্ষাসম্পর্কে বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশ ইংরেজি শিক্ষার জন্যই ব্যয় হবে। ভারতবাসীদের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসার করাই কাম্য এবং সে শিক্ষা হবে ইংরেজির মাধ্যমেই।

এভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হলেও দেশে সংস্কৃত চর্চা কখনই লুপ্ত হয় নি। স্কুল কলেজ ছাড়াও বহু প্রাচীন কাল থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু টোল চতুষ্পাঠীতে সুদীর্ঘ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও কাব্য পড়ার রীতি চলে এসেছে। সংস্কৃতচর্চা ছিল ব্রাহ্মণদের অধিকার। বংশ পরম্পরা ধরে ব্রাহ্মণরাই সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ কাব্য ব্যাকরণ ন্যায় জ্যোতিষ স্মৃতির অধ্যাপনা করে এসেছেন, ভাষ্য অনুভাষ্য রচনা করে এসেছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেশব্যাপী যে পরিবর্তন হল তার প্রতিক্রিয়া এসে পড়ল এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতচর্চার উপরে। তারা রাজা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা হারালেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক ধর্মকর্ম সম্পাদনের সহায়ক হিসাবে তাঁদের অস্তিত্ব টিকে রইল। মোগল রাজত্বের পর কোম্পানীর রাজত্বের সূচনাতে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে একটি নিঃশব্দ বিপ্লব ঘটে গেল। সংস্কৃতির ধারক ছিলেন

এই ব্রাহ্মণ সমাজ । ব্রাহ্মণ সমাজের বিপর্যয়ের ফলে বিশুদ্ধ সংস্কৃত বিদ্যা ও জ্ঞানের অনুশীলন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে । অবস্থা এমনই দাঁড়াল যে সর্বদর্শন সংগ্রহের ভূমিকায় জয়নারায়ণ তর্কালঙ্কার দুঃখ করে লিখেছিলেন, তাঁর সময়ে পণ্ডিতেরা চারখানা বইও পড়েন না । সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পূর্বে বাঙালি পণ্ডিতদের অজ্ঞতার বহর ছিল এমনই যে সংস্কৃত ভাষার নাটক সম্বন্ধে স্যর উইলিয়াম জোন্স-এর অনুসন্ধিৎসা তাঁরা মেটাতে পারেন নি ।[1]

সংস্কৃত ভাষায় যে কী বিপুল ঐশ্বর্য লুকিয়ে আছে, তার সংবাদ তখন সাধারণভাবে জানার ছিল না । এর কাব্যসম্পদের প্রতি আগ্রহ বলতে গেলে তখন শূন্যই । তত্ত্বসম্পদ সম্বন্ধেও সেই কথা । স্মৃতি ও জ্যোতিষের চর্চা নিত্যকার প্রয়োজনে লাগত মাত্র । সংস্কৃত সাহিত্যের যথার্থ কাব্যরসের সন্ধান কেউ রাখত না বললেই বোধহয় আলঙ্কারিক রীতিনীতির যান্ত্রিক প্রয়োগ হল কাব্যপাঠের সার । মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্যকে নতুন ভাবে পড়তে চেয়েছিলেন তাই এই আলঙ্কারিক পদ্ধতিতে তাঁর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না । বংকিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে আলঙ্কারিকদের নমস্কার করে বিদায় দিয়েছিলেন ।

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রাচীন ও ইতিহাস উদ্ধারের লক্ষ্য নিয়ে । উইলিয়াম জোন্স্ (১৭৪৬-১৭৯৪) ছিলেন এর প্রথম সভাপতি জোন্স্-এর চেষ্টাতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু হয় নতুন ভঙ্গিতে । তাঁর সঙ্গে ছিলেন কোলব্রুক, হালহেড প্রভৃতি প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা । তাঁরা সংস্কৃতকে কেবল দৈনিক আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনের জন্য ছাড়াও কাব্যরসাস্বাদন ও গবেষণার জন্য চর্চা করার আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন । জোন্স্ শকুন্তলা, গীতগোবিন্দ, হিতোপদেশ, মনুসংহিতার অনুবাদ করেছিলেন । কোলব্রুক করেছিলেন ভগবদ্গীতার অনুবাদ, হোরেস হেম্যান উইলসন (১৭৮৬-১৮৬০) করেছিলেন মেঘদূত এবং বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ, এই ভাবে ইংরেজ পণ্ডিতদের উদ্যোগে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার

---

১. Sushil Kumar De, Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857), 1962, p. 27

নতুন রীতি প্রচলিত হল। প্রধানতঃ গবেষণার জন্য হলেও সংস্কৃত ভাষার বিপুল সাহিত্য সম্পদ বিদ্বৎজনদের কাছে একে একে উদ্ঘাটিত হতে থাকে। মধুসূদন একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, খ্রীষ্টান হিসাবে হিন্দু পুরাণের জন্য তাঁর কোন মাথাব্যথা নেই, কিন্তু তিনি পূর্বপুরুষদের চমৎকার পৌরাণিক আখ্যানগুলির কবিত্বরসে মগ্ন। এই মনোভাবটি সংস্কৃত চর্চার নতুন অবস্থাওয়ারই ফল। তিনি আরও বলেছিলেন, রাজেন্দ্রলালের মত তিনি 'বহুক-ই বৈয়াকরণ'ও নন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র সংস্কৃতের একজন মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন বটে কিন্তু তিনি প্রচলিত ধারায় সংস্কৃত চর্চা করেন নি। তিনি ছিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে গবেষণার যে রীতিপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল, তিনি ছিলেন তারই উত্তরসাধক। এই গবেষণা-পদ্ধতির সঙ্গে আমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে অবহমানকাল প্রচলিত অধ্যয়ন-পদ্ধতির বিশেষ সম্পর্ক নেই।

সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ তত্ত্ব আলোচনার নতুন পরিমণ্ডলও অন্যভাবে গড়ে উঠেছিল। রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩) উপনিষদ ও বেদান্ত আলোচনার নতুন উপযোগিতার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। রামমোহনের পরে তত্ত্ববোধিনী সভায় এবং ব্রাহ্মসমাজে বেদান্ত উপনিষদের চর্চা অব্যাহত ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য এর সঙ্গে মধুসূদনের যোগ খুব যে তেমন ছিল না। কিন্তু সংস্কৃত অনুশীলন নতুন তাৎপর্য নিয়ে আসছে, গভীরতর অধ্যয়নের বিষয় হয়ে উঠছে, এর রসসম্পদ আমাদের রুচিকে নতুনভাবে তৈরি করে তুলছে, তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত শুধু ব্রাহ্মণ এবং পুরোহিতদের চর্চার বিষয় রইল না – বৃহত্তর পরিধিতে ছড়িয়ে গেল। সংস্কৃত-সাহিত্য সম্পদের রসে অনুরক্ত হয়েই বিদ্যাসাগরের মত পণ্ডিতলেখকেরা শকুন্তলা, উত্তরচরিত মহাভারতের অনুবাদে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

একদিকে ইংরাজি স্কুল কলেজে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য ও ইংরেজি ভাষার প্রতি আগ্রহ, অন্যদিকে স্কুল কলেজ ও টোলের চিরাচরিত রীতির সংস্কৃত শিক্ষা – এর মাঝামাঝি বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের একটি ধারা ছিল। শাসকদলও শিক্ষার

মাধ্যম হিসাবে দেশভাষার অপরিহার্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে শিক্ষা কমিটি লেখেন —

We are deeply sensible of the importance of encouraging the cultivation of the vernacular languages.

We conceive the formation of a vernacular Literature to be the ultimate object to which all our efforts must be directed.[১৩]

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লর্ড অকল্যাণ্ড ঘোষণা করলেন যে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফল পরীক্ষা না করে বাহন পরিবর্তন করা হবে না।

বাংলাকে উচ্চশিক্ষার বাহন করা না হলেও বালক বালিকাদের জন্য দেশে বহু বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল স্কুল সোসাইটির এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে। প্রথম দিকে কিছু কিছু সাহায্য করলেও ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে সরকার মোটেই প্রায় এদিকে সাহায্য করেন নি। তবে বহু পরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় মডেল স্কুল বা আদর্শ বাংলা স্কুল স্থাপনের ও তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপরে। ১৮৩৩-১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার জনশিক্ষার বিবরণ দিতে গিয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল দেখিয়েছেন স্কুল বুক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে দেশীয় পাঠশালা গুলিতে ভালভাবে বাংলা শিখে আট দশ বছরের বালকেরা সোসাইটির ইংরেজি স্কুলে পড়তে যেত। হিন্দু কলেজের অধীনেও এরকম একটি বাংলা স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, আজও তা হিন্দু স্কুল নামে চলছে এবং ইংরাজি স্কুল থেকে ছাত্ররা পরে হিন্দু কলেজে পড়তে যেত। অ্যাডামের ভাষায় "the society's scholars are said to rank among the highest ornaments of the college.

১৩। কৃষ্ণনগর কলেজ শতবর্ষ স্মারক সংখ্যায় যোগেশচন্দ্র বাগলের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত পাঠশালাগুলির মধ্যে ডেভিড হেয়ার পরিচালিত আরপুলি পাঠশালায় বাংলাভাষার রীতিমত চর্চা হ'ত। আডাম তাঁর রিপোর্টে এ বিষয়ে বলেন –

According to the best report, it contained about 275 boys, who were instructed by a Pandit and four Native teachers, and were divided into eleven classes, occupied with different Bengalee studies from the alphabets upward. They were taught reading, writing , spelling, grammar and arithmetic, and the plan on which duties of the school were conducted was nearly similar to that of an English School. In order to afford sufficient time for the boys to acquire a considerable knowledge of Bengalee before they began to learn English, no pupil was admitted into the school above eight years of age. The scholars were promoted to the society's English School or to the Hindu College as a reward of their proficiency in Bengalee, the study of which they were required to continue until they acquired a complete knowledge of the language. This attention to the cultivation of the language of the country, the chief medium through which instruction can be conveyed to the people was a highly gratifying feature in the operations of the Society ; and an additional advantage of the school of Arpuly was the example which it afforded to the whole of the indigenous schools.[১১]

---

১১. Adam's report -- Calcutta University, p. 13

স্মরণ করা যেতে পারে ইংরেজিনবীশ সুনামধন্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আরপুলি পাঠশালার ছাত্র ছিলেন । তিনি অথবা হিন্দু কলেজের ইংরেজি শিক্ষিত ছাত্ররা অনেকেই যে বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধা করে উৎকৃষ্ট বাংলা রচনা প্রকাশ করেছেন তার কারণ পাঠশালাগুলির ভাষা শিক্ষা প্রণালী । এই ধারাবাহিক শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে সংস্কৃতের স্থান ছিল না ।

১৮৩৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কুল সোসাইটি উঠে গেল, বাংলার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাটিও নষ্ট হয়ে গেল । আরপুলি পাঠশালাও উঠে গেল, তার ইংরেজি শাখাটি পটলডাঙা ইংরেজি ইস্কুলের সঙ্গে যুক্ত হল । এই স্কুলের শিক্ষামান খুবই ভাল ছিল এবং পটলডাঙায় সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদের সোসাইটির ব্যয়ে (যতদিন সোসাইটি ছিল) হিন্দু কলেজে পাঠান হত । পরে পটলডাঙা ইস্কুল হিন্দু কলেজের 'প্রিপেরেটরী স্কুলে' পরিণত হয় ।

যে সময়ে শিক্ষাধারাতে ক্রমশঃ ইংরেজি প্রবণতা দেখা দিচ্ছে তখনই মধুসূদন কলকাতায় এসে হিন্দু কলেজে ভর্তি হলেন । দেশের পাঠশালা এবং মায়ের প্রভাবে তাঁর বাংলা শিক্ষার বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল কিন্তু পাশ্চাত্যের অনুকরণের নেশায় এবং বিলাত গিয়ে মহাকবি হবার আকাঙ্ক্ষায় তিনি বাংলা ভাষাকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করলেন - আচার রুচি সবদিকেই বিজাতীয় ভাব প্রকট হয়ে উঠল । কিন্তু বাংলার শিক্ষা তাঁর পরবর্তী জীবনে কিভাবে কাজ করেছে তা তাঁর কাব্য আলোচনা করলেই বোঝা যায় । বহু ভাষাবিদ্ হবার পরেও সুদূর ইংলেণ্ডে বসে বন্ধু গৌরদাসকে লেখা চিঠিতে তাঁর স্বদেশী ভাষা-প্রীতির স্বরূপ দেখে বিস্মিত হতে হয় । অতি অল্পকালের মধ্যে পর পর কয়েক খানি কাব্য নাটকে তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় দেবার পরেও লক্ষ্মীর সাধনায় বিদেশ পাড়ি দিলেন কিন্তু সেখানে বহু তিক্ত অভিজ্ঞতার পর ২৬ জানুয়ারী ১৮৬৫এ যখন পত্রে লেখেন - If there be any one among us anxious to leave a name behind him, and not pass away into oblivion like a brute, let him devote himself to his mother tongue ... Let those, who feel that they have springs of

fresh thought in them, fly to their mother tongue.... our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up.[11] — তখন তা যত করুণ ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

তবু মনে রাখতে হবে বাংলা বা সংস্কৃত চর্চা, এমনকি ইংরাজি চর্চাতেও মধুসূদনের লক্ষ্য কখনই নিছক জ্ঞানসাধনা ছিল না। এক মাত্র কবি হওয়া, বিচিত্র কল্পনাকে ভাষার পক্ষীরাজে চড়িয়ে মুক্তগতি করা — জগতে কেবলমাত্র কবি হিসাবে নিজের পরিচয় রেখে যাওয়া — এরই জন্য তাঁর যা কিছু সাধনা। তাই তিনি তখনকার সংস্কৃত শিক্ষার পদ্ধতি অবলম্বন না করে কেবল আনন্দ ও সৌন্দর্যের সন্ধান চালিয়েছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে। পুরাণকে ধর্মগ্রন্থ নয়, গল্প ও রূপকল্পের আকর হিসাবে মর্যাদা দিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারত তো তাঁর মনের বিস্ময় আর নির্ভরের স্থল। হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের কাছে পড়েছিলেন বলে ইংরাজি ভাষার সৌন্দর্য শক্তি আর মহিমা যত সহজে তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল, বাংলা-সংস্কৃতে তা হয় নি, বহু সাধনা, বহু বেদনার কাহিনী যুক্ত হয়ে আছে তার সঙ্গে।

২. মধুসূদনের সংস্কৃত শিক্ষা :

মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা করেছিলেন এমন উল্লেখ করেছেন তাঁর জীবনীকারেরা। কিন্তু তার বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা যায় নি। বাল্যকালে বারো তেরো বৎসর বয়স পর্যন্ত জন্মস্থান সাগরদাঁড়ীতে মায়ের কাছে থেকে গ্রামের যে পাঠশালায় পড়েছিলেন সেখানে বাংলা ভাষাশিক্ষার সঙ্গে কিছু ফার্সী কবিতা পড়েছিলেন বলে 'জীবনচরিত' রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসু উল্লেখ করেছেন। সে সময় থেকেই তাঁর জ্ঞানার্জনস্পৃহা ও কাব্যানুরক্তি দেখা দিয়েছিল। এর পরে "পিতার ইচ্ছানুসারে মধুসূদন কলিকাতায় আসিলেন এবং অল্পদিন খিদিরপুরের কোন ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়নের পর, অনুমানিক

---

১১. ১১২ নং পত্র।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন।"[13]

হিন্দু কলেজে সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা ছিল না, ইংরেজি বাংলা ছাড়া ফার্সীও পড়ানো হত সেখানে। ডিরোজিও রিচার্ডসন প্রভৃতি বিদেশি পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে হিন্দু কলেজে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা কি প্রকারের ছিল সেকথা সুবিদিত। বাংলা পড়ানো হত, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বাংলা চর্চার কোন পরিবেশই সেখানে ছিল না। রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ্যপুস্তকের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ইংরেজি সাহিত্য, পুরাবৃত্ত এবং গণিতের অনেক ভাল এবং উচ্চমানের বইয়ের নাম আছে কিন্তু বাংলা বইয়ের নাম নেই। ডিরোজিও রিচার্ডসনের মত রসিক পণ্ডিত শিক্ষক ইংরেজির অধ্যাপনা করেছেন বলেই ছাত্রদেরও প্রতীচ্য সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতিই আকর্ষণের সৃষ্টি হয়েছে। রাজনারায়ণ তাঁদের বাংলা শিক্ষার কৌতুককর বর্ণনা দিয়েছেন —

"আমাদিগের কলেজে যিনি বাঙ্গালা পণ্ডিত ছিলেন তিনি একসময়ে রামকমল সেনের পাচক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা নানারূপ গল্প করিয়া সময় কাটাইতাম।"[14]

তিনি নিজে যে পরবর্তী কালে বাংলায় উৎকৃষ্ট পদ্য-গদ্য লিখতে পারতেন তার কারণ 'মাতৃভাষার বৎসলতাগুণ' এবং ফার্সী শিক্ষার ফল।

ফার্সী ভাষাও যে খুব ভালভাবে পড়ানো হত রাজনারায়ণের বিবরণে তা মনে হয় না। "তখন হিন্দু কলেজে পারশি পড়াইবার জন্য একজন মৌলবী নিযুক্ত ছিলেন তিনি মস্ত এক আমামা পাগড়ী মাথায় দিয়া আসিতেন।"[15] রাজনারায়ণ অবশ্য এই মৌলবীর কাছে ফার্সী না পড়ে তাঁর পিতাঠাকুরের মুন্সীর কাছে পড়তেন, ফার্সী কবিতার সৌন্দর্য তাঁর মনোহরণ করেছিল, এবং পরবর্তী কালে তা তাঁর কাজেও

---

১৩. জীবনচরিত, পৃ. ১৮

১৪. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৬১, পৃ. ৩২

১৫. তদেব, পৃ. ৩১

85201
1984
NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR

লেখেছে । "এরূপ প্রীতি ভাবের বক্তৃতা যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম তাহার কারণ আমার পারসি শিক্ষা ।"১৬ পরে রাজনারায়ণ সংস্কৃত ভাষাও অধিগত করেছিলেন । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে তিনি উপনিষদ্ পড়েছেন এবং সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা করবার সময়ে সেখানকার পণ্ডিতদের সহায়তায় উইলিয়াম অপটাম প্রেসের-প্রকাশিত রামায়ণের আদিকাণ্ড ও কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গ পড়েন । উত্তরকালে তিনি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় কঠ, ঈশ, মুণ্ডক, কেন, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের অনুবাদও করেন । বোঝা যাচ্ছে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ভাষাশিক্ষা বিষয়ে আগ্রহ বিদ্যমান ছিল ।

মধুসূদন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওঠার পরেই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩) এবং হিন্দু কলেজ ছেড়ে দেন । পরে তিনি বিশপস্ কলেজে ভর্তি হলেন । সেখানেই তিনি প্রথম সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ পান । 'মধুস্মৃতি'তে নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন –

"বিশপস্ কলেজে মধুসূদন গ্রীক ও লাটিন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া এই দুইটি ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন । এখানে তিনি পণ্ডিত কৃষ্ণকুমারীর নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন ।"১৭

হিন্দু কলেজে না হলেও বিশপস্ কলেজে সেকালে সংস্কৃত পড়ানো হত । অবশ্য তার উদ্দেশ্য বড় তো ছিল খ্রীস্টান মিশনারীদের নিজস্ব প্রয়োজন সিদ্ধি । হিন্দুধর্মের অনুসন্ধান করাই তাঁদের উদ্দেশ্য । এজন্য হিন্দু মূল শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার । অ্যাডাম তাঁর ১৮৩৫ এর শিক্ষাবিষয়ক প্রতিবেদনে বিশপস্ কলেজে সংস্কৃত শিক্ষাদানের বিবরণ দিয়েছেন –

"These Pandits are employed to teach Bengalee to the students destined for Bengal and the catechists and missionaries of the station in the vicinity, as well as to teach Sanscrit to those whose advancement in the knowledge makes it important

---

১৬. তদেব ,

১৭. নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি, ২য় সং , পৃ. ৪৪

that they should possess this means of exploring Hindooism in the sources, which is the case with the aboriginal Native students and also with those destined for the South of India.[১৮] দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা শেখাবার অবশ্য তেমন সুবন্দোবস্ত ছিল না except by the occasional aid of some old students from Madras.[১৯] এটা স্বাভাবিক যে খ্রীষ্টীয়দের দ্বারা পরিচালিত কলেজটির শিক্ষা পদ্ধতিতে ধর্মীয় ব্যাপারই ছিল প্রধান।

The system of instruction appears to the in the main that of English Collegiate education with such modification(especially, as I am informed, in the classical part) as may best suit the circumstances of those who are to teach Christianity in a country not Christian, and to whom, therefore, poets and orators, though not useless, are deemed a less important object of concern than those writings which exhibit the chief moral and intellectual features of Greek and Roman, Literature.[২০] কেবল কাব্য-সাহিত্যের রসগ্রহণ নয়, ঐ কলেজে ছাত্রদের তার সঙ্গে বিশেষতঃ ভাষাতে এমনভাবে পুরোপুরি শিক্ষিত করতে হবে, যাতে মূল গ্রন্থাদি পাঠে কোন বাধা না থাকে।

মধুসূদন যখন ভর্তি হন তখনও বিশপস্ কলেজে সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। তবে নগেন্দ্রনাথ সোমের কথায় কৃষ্ণস্বামী সংস্কৃত পড়াতেন — এ বিষয়ে কিছু সন্দেহের অবকাশ আছে। 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থে শ্রীসুরেশচন্দ্র মৈত্র দেখিয়েছেন রামচন্দ্র পণ্ডিত পড়াতেন সংস্কৃত ও বাংলা, এছাড়া রাজকুমার নামক এক ভদ্রলোকও বাংলা পড়াতেন। কৃষ্ণস্বামী ছিলেন সিংহলী ও তামিলভাষার শিক্ষক।[২১]

১৮, ১৯, ২০. Adam's Report, Calcutta University, p. 28-29.

২১. Bengal Directory, 1836 । দ্র. সুরেশচন্দ্র মৈত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত : জীবন ও সাহিত্য, ১৯৭৫, পৃ. ৭৭

ড. ঘোষ কলেজের কাগজপত্র ঘেঁটে যে শিক্ষকদের নাম পেয়েছেন তাঁরা মধুসূদনের ঐ কলেজে ভর্তি হবার সময় পর্যন্ত টিকে ছিলেন কিনা তা অবশ্য জোর করে বলা যায় না। রাজনারায়ণ বসুর কাছে ১৪ই জুলাই ১৮৬০ তারিখে লেখা মধুসূদনের পত্রে এক কুমারস্বামীর কথা পাই। I remember Kumar Swami, Alas ! What can I do for him ! - ইনি বিশপ্‌স্‌ কলেজের কুমারস্বামী কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না; ভদ্রলোকের দুর্গতির কারণটি কি তাও জানার উপায় নেই। যিনিই পড়িয়ে থাকুন, ঐ কলেজে যাবার পরেই তাঁর সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল এবং সেখানে সংস্কৃত ভালভাবেই পড়ানো হত তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত ছাড়াও তিনি ঐখানে গ্রীক ল্যাটিন শিখেছিলেন। আর তাঁর কাছে মাতৃভাষার সমতুল্য ইংরাজি তো আছেই। লেখাপড়া নিয়ে তখন তাঁকে এতই ব্যস্ত থাকতে হত যে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবার অবকাশও তাঁর হ'ত না।

It is a matter of regret to me that I have not been able to answer two very kind letters ere this, but if you were to know how my time is engaged here, I am sure you would excuse me.[22]

এমন কি ছুটির সুযোগও বন্ধু গৌরদাসের সঙ্গে দেখা করার সময় পেলেন না। "I am really sorry to say that for various reasons I have suffered our last vacation to pass without giving you a call."[23]

বিশপ্‌স্‌ কলেজে মধুসূদনের দীর্ঘকাল পড়ার সুযোগ হয় নি, বছর চারেক ছিলেন সেখানে; কোন কারণে বিরক্ত হয়ে তাঁর পিতা রাজনারায়ণ দত্ত তাঁর মাসিক সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ায় এবং যে সব আশায় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা পূরণ না হওয়ায় ভগ্নহৃদয় মধুসূদন কাউকে না জানিয়ে একদিন সুদূর মাদ্রাজে পাড়ি দিলেন। এই চলে যাওয়ার সঠিক তারিখটি পর্যন্ত জানবার উপায় নেই। আত্মীয়-বন্ধুবর্জিত

---

২২. গৌরদাস বসাককে লেখা পত্র, ৩৩নং

২৩. ৩৪নং পত্র

অপরিচিত পরিবেশে গিয়ে জীবিকার্জনের জন্য অশেষ কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে তাঁকে ; বক্ষঃরোগে আক্রান্ত হয়ে কষ্ট পেয়েছেন ; অবশেষে অনাথ বালক বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুলে সামান্য মাইনেতে শিক্ষকতার কাজ নিতে হয়েছে । তবু তাঁর ভাগ্যকে জয় করে অবস্থার উন্নতি ঘটাবার জন্য চেষ্টার যেমন অন্ত ছিল না, তেমনি সাহিত্যসাধনাও ছিল অব্যাহত । বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে ইংরাজি ভাষায় প্রবন্ধ কবিতা লিখে চলেছেন, আর চলেছে অবিশ্রান্ত জ্ঞানচর্চা । এ সময়ে তিনি কঠোর পরিশ্রম করে নানা ভাষা শিখেছেন । এই পরিশ্রম তাঁর বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য নয় ।

"মধুসূদন বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার ও অধ্যয়নের নিষ্কর্ষ, তাঁহার কাব্যানুরক্তি । অন্য দেশীয় কাব্য-শাস্ত্রের অনুশীলনে তাঁহার সমকক্ষ কোন ব্যক্তি, বঙ্গদেশে, বোধহয়, এ পর্যন্ত অনুসরণ করেন নাই ।[১৪] বন্ধু গৌরদাস বসাককে ১৮ই অক্ট, ১৮৪৯ তারিখের পত্রে লিখেছেন – 'Perhaps you do not know that I devote several hours to Tamil. My life is more busy than that of a school boy. Here is my routine : 6 to 8 Hebrew, 8 to 12 school, 12-2 Greek, 2-5 Telegu and Sanskrit, 5-7 Latin, 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers.'[১৫] বহু ভাষার চর্চার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতর চর্চাও চলেছে, এ সময়ে তাঁকে সাহায্য করবার হয়তো কেউ ছিলেন না ; তবে বিশপস্‌ কলেজে শিক্ষার সময় ভাষাটি এমন আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল যার ফলে পরবর্তী কালে সংস্কৃত সাহিত্যের রসভাণ্ডারটি তাঁর কাছে অনধিগম্য থাকে নি । বিবিধ ভাষা-সাহিত্য চর্চা চলেছে নিজের দেশীয় ভাষার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করবার জন্য নিয়ে । সংস্কৃতচর্চা যে কেবল বঙ্গ ভাষার সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি সৃষ্টির কাজে লেগেছিল তা নয়, সংস্কৃত ভাষায় যে পুরাণ সাহিত্যের রূপলোক তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, নিজসৃষ্টিতে তা বিশেষভাবে প্রতিফলিত

১৪. জীবনচরিত, পৃ. ১১

১৫. ৪২নং পত্র

হতে দেখতে পাই । একারণেই তাঁর সংস্কৃত-চর্চা সম্পর্কীয় তথ্যের আলোচনা প্রয়োজন – পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্য কতখানি গ্রহণ বা বর্জন করেছিলেন তার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিমানসের স্বরূপটিই ধরা পড়ে ।

এসময়ে তিনি কোন্ কোন্ বই পড়েছিলেন, জানবার আর কোনো উপায় নেই । তবে বিদেশি মহাকবিদের সঙ্গে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতি এবং বিবিধ পুরাণ সাহিত্য পড়ে ফেলেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই । কালিদাসের সৌন্দর্যলোক তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করত, যদিও তাঁর প্রেম বিষয়ের বাড়াবাড়ি সর্বত্র তিনি সমর্থন করতে পারেন নি । মহাকাব্য এবং বিভিন্ন পুরাণ সাহিত্য থেকে বারে বারে বিষয় গ্রহণ করেছেন – কোথাও তা এসেছে মূল কাহিনী রূপেই, কোথাও তুলনা বা চিত্রকল্প রূপে, কোথাও বা শুধুই আভাসের রূপে অনুসরণ; আর মহাকাব্য পুরাণ সংস্কৃত সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে কখনও যথাযথ আর কখনও কিছুটা পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করেছেন । দেশীয় পুরাণের সঙ্গে পাশ্চাত্য পুরাণকে মিশিয়ে নিয়েছেন অনেক সময়েতে । যে কবির মন প্রাত্যহিকের মলিনতাকে এড়িয়ে স্থাপিত কল্পনা ও পরিকল্পনে মুক্তি লাভ করেছে, পুরাণ সাহিত্য তার কবিকল্পনাকে কোন পথে চালিত করেছিল সে আলোচনা অনর্থক নয় । পরবর্তী পরিচ্ছেদ গুলিতে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তৃততর আলোচনার চেষ্টা করব ।

মাদ্রাজ প্রবাস কালেই ইংরেজিতে ক্যাপটিভ লেডি লেখার সময়েই (১৮৪৯ খ্রী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত) মধুসূদনের পরিচয় ঘটেছিল হিন্দু-পুরাণের সঙ্গে । ১৯শে মার্চ, ১৮৪৯ তারিখে গৌরদাস বসাকের কাছে চিঠিতে লিখছেন – "Pray, tell Bhoodeb that when he gets my poem, he will be surprized at my knowledge of Hindu Antiquities, for it is a thorough Indian work, full of Rishis -Calis - Lutchmees - demes, Rudras and all the Devils incarnate, whom our orthodox fathers worshipped. The last canto contains an episode called the "Raj-shooya Jujnum" with a terrible battle and 'a' that".[26]

---

২৬. ৩৭নং পত্র ।

মাদ্রাজ থেকে দেশে ফিরে আসবার অল্পকাল পরে যখন তিনি একের পর এক নাটক প্রহসন কাব্য রচনা করে বাঙালী পাঠককে তাঁর আশ্চর্য কল্পনা শক্তি ও ভাষার ঐশ্বর্যের পরিচয় দিয়ে একাধারে বিস্মিত স্তম্ভিত করে দিয়েছেন, তখনও পুলিশ কোর্টের চাকরি আইন পরীক্ষার প্রস্তুতি ও সাহিত্য সাধনার অতি ব্যস্ততার মধ্যে চলেছে তাঁর সংস্কৃত চর্চা। তিলোত্তমা প্রকাশিত হয়ে গেছে, মেঘনাদবধ কাব্য রচনা চলেছে - সে সময়ে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে দুটি মূল্যবান কথা পাই - প্রথমতঃ I have a great deal to do. I have my office work to attend to ! I generally devote four or five hours to Law ! I read Sanskrit, Latin and Greek and scribble. All this is enough to keep a man engaged from morn to dewy eve and so on.[২৭]

এই সময়ের সাধনার সংবাদের সঙ্গে তাঁর মানস প্রবণতাও একটি সূত্র ধরে দিলেন ঐ পত্রেই - I must tell you, my dear fellow, that though, as a jolly Christian youth, I don't care a pin's head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry. A fellow with an inventive head can manufacture the most beautiful things out of it."

পরের চিঠিতেই আবার রঙ্গলালের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কিত আলোচনার শেষে নিজের সাহিত্য-গুরুদের উল্লেখ করেছেন - Byron, Moore and Scott form the highest heaven of poetry in his estimation. I wish he would travel further. He would then find what "hills peep over hills" - what "Alps on" "Alps arise !" As for me, I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa,

---

২৭. ৫৭নং পত্র।

Virgil, Kalidasa, Dante (in translation) Tasso (Do) and Milton. These কবিকুলগুরু ought to make a fellow a first rate poet - if Nature has been gracious on him."[২৮]

নিজের রুচিবৃত্তি ও আদর্শ সম্পর্কে মধুসূদনের নিজেরই এমব দলিল সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। লক্ষণীয় এই যে ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস তিনি মূল সংস্কৃতেই পড়েছেন — আডামের রিপোর্টে বিশপস্ কলেজে সংস্কৃত শিক্ষার যে মানের প্রশংসা পাওয়া গেছে তারই সমর্থন মেলে এতে।

তবু অনেকের ধারণা মধুসূদনের সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান তেমন গভীর ছিল না। 'মধুস্মৃতি'র লেখক দেখিয়েছেন যখন মধুসূদন একই সঙ্গে মহাকাব্য, নাটক এবং ব্রজাঙ্গনার মত গীতি কবিতা লিখে চলেছেন তখনও তিনি সর্বদা সংস্কৃত পন্ডিত সঙ্গে রাখতেন সাহায্যের জন্য। একজন সাহায্যকারী "সংস্কৃত পন্ডিত রামকুমার বলিতেন যে গৌড়দাসী প্রাচীনে তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল।"[২৯] তিলোত্তমাসম্ভবের পাণ্ডুলিপি — যেটি কবি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপহার দিয়েছিলেন এবং যতীন্দ্রমোহন যেটি সযত্নে বাঁধিয়ে আজীবন নিজের লাইব্রেরীতে রেখেছিলেন তারও অনেকাংশই সংস্কৃত পন্ডিতের হাতের লেখা। বিদ্যোৎসাহী সভার সম্বর্ধনা গ্রহণ করতে যাবার সময়েও পন্ডিত রামকুমার সঙ্গে ছিলেন। এমন গল্পও প্রচলিত আছে যে পন্ডিতদের কাছে একই ভাবের নানা আভিধানিক প্রতিশব্দ জেনে নিয়ে শব্দ বাছাই করে তিনি কাব্য রচনা করতেন। কোন সমালোচক মন্তব্য করেছেন — "মধু কবির সংস্কৃত ব্যাকরণের বিদ্যা খুব পরিপক্ক ছিল না — তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন 'আমি রাজেন্দ্রলালের মত বড়ুক-১ বৈয়াকরণ নহি।' না থাকিলেই বা কি হইবে? তিনি যে একজন born linguist, অসাধারণ কাব্যশিল্পী।"[৩০]

---

২৮. ৫৮নং পত্র।

২৯. মধুস্মৃতি, নগেন্দ্রনাথ সোম, ২য় সং, পৃ. ৮৬

৩০. শশাঙ্কমোহন সেন, মধুসূদন, ১৮৫১, পৃ. ৫১

এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উক্তি –

"কিছুদিন পরে মধু আবার দেশে ফিরিয়া আইসে । ঐ সময়ে নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হওয়ায় ঐ পদে উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার জন্য একটী প্রতিযোগী পরীক্ষা গৃহীত হয় । মধু ও আমি উভয়েই ঐ পরীক্ষা দি এবং উক্ত পদ আমারই হয় ।... নর্মাল স্কুলে উক্ত পরীক্ষা দিবার সময়ও মধুর বাঙ্গলা ভাষায় তাদৃশ দখল হয় নাই । [illegible] তখনও যে পৃথিবী লিখিতে প্রিথিবী লিখিত ; কিন্তু সেই মধু কিছুকাল পরেই আমার নর্মাল স্কুলে থাকার সময়েই , মেঘনাদবধ কাব্য প্রণয়ন করে [illegible] এবং মধুর সেই মেঘনাদবধ কাব্য অতি সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমিই নর্মাল স্কুলে আমার ছাত্রদিগকে পড়াইয়াছি ।"[31]

এই উক্তিটি দুদিক থেকে বিচার করা যেতে পারে । এর থেকে ধারণা হতে পারে সংস্কৃত শিক্ষাই মধুসূদনের ভালভাবে হয়নি – তাই এই বানান ভুল । এমনও হতে পারে দীর্ঘ প্রবাসের পরে বাংলা অক্ষর লেখার অভ্যাস তাঁর চলে গিয়েছিল । বস্তুতঃ তার আগে তো বাংলা তিনি লেখেনই নি কখনও । বিশপস্ কলেজে ও মাদ্রাজে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও চর্চার পরেও মধুসূদন পৃথিবী বানানও জানতেন না – এটা ভাবা যায় না, বাংলা হরফে লিখতে অসুবিধা বোধ করেছেন সেটাই সম্ভাব্য । স্বল্পকাল পরেই তৎসম শব্দ বহুল মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় যিনি এমন শক্তির পরিচয় দিলেন , তাঁর সম্পর্কে এমন অসংগত কল্পনা না করাই সংগত । তবে তাঁর রচনা অনেক সময়েই অন্যেরা লিখে দিতেন বা নকল করে দিতেন সেটা জানা যায় । তাতে বোঝা যায় বাংলা হরফে লেখাটা তাঁর তেমন সহজ আসত না ।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বানান সম্পর্কে অনবধানতার কথা কলেজের অধ্যক্ষের তেত্রিশতম প্রতিবেদনে উল্লিখিত হয়েছে । অধ্যক্ষ স্বীকার করেছেন সংস্কৃত জ্ঞান না থাকার ফলেই এ ধরণের ভুল হয় । মধুসূদনও যে 'শিব' লিখতে 'সীব' লিখতেন তা তো নিজেই স্বীকার করেছেন । পরবর্তী কালেও মধুসূদন যখন মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের সম্ভবতঃ কবি দীননাথ ধরের নকল করা কপি রাজনারায়ণ

---

৩১. যোগীন্দ্র নাথ বসুর কাছে লেখা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চিঠি , জীবন চরিত, পরিশিষ্ট, পৃ. ১৪

বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছেন, তখন তিনি লিখেছেন — The copy, I enclose, though neatly written is so full of bad spellings that I did not know whether you would be able to make any thing of it.[৬২]
এ ভুল নকলকারের না লেখকেরই তা বলা যায় না। কিন্তু এ ধরণের ভুল উৎকালে একা তিনি না করে থাকলেও কেন তিনি আদৌ এ ভুল করলেন অথবা দীননাথের লেখা সংশোধন করলেন না, সেটা ভাবতে কিন্তু আশ্চর্য লাগে। এসব কারণেই অনেকের মনে এমন ধারণা দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে যে তিনি সংস্কৃত ভাষাটা ভালভাবে জানতেন না। অথচ বিভিন্ন তথ্যাদি থেকে এমন প্রমাণে উপনীত হওয়া যায় যে সংস্কৃত শিক্ষা তাঁর বেশ ভালভাবেই হয়েছিল। সংস্কৃত শিক্ষা থাকলে তৎসম শব্দে বানান ভুল হবার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। বাংলা ব্যাকরণেও যে তাঁর ভুল হ'ত সেটা তিনি নিজেও জানতেন, তাই শর্মিষ্ঠা নাটকের ব্যাকরণগত ভুলগুলিই শুধু তিনি রাজনারায়ণকে দিয়ে শুধরে নিতে রাজী ছিলেন, অন্য কিছু নয়। এমনও হতে পারে মধুসূদনের কবি-মন বানান বা ব্যাকরণের মত জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় নি — সংস্কৃত কবিদের বাক্যরীতি — যা তাঁদের ভাবকে শিল্পমূর্তি দান করে — তাই তিনি অধিগত করতে চেয়েছিলেন।

সাহিত্য জীবনের মত তাঁর ব্যক্তি জীবনও বহু বিরোধী ঘটনার সমবায়ে বিস্ময়ের রহস্যে আবৃত। হিন্দু কলেজে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার সুযোগ পান নি — পেয়েছিলেন মিশনারীদের কলেজে কিন্তু তাঁর তৎকালীন ভাবনাদির তেমন সংবাদ জানা যায় না। তারপরে চলে গেলেন সুদূর মাদ্রাজে, দীর্ঘ দিন পরে ফিরে এলেন পুরো সাহেব হয়ে — ইংরেজ পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে এবং বাংলাভাষা প্রায়-বিস্মৃত হয়ে। লোকের ধারণা হ'ল হ্যাট কোট পরিহিত এবং ইংরেজি কাব্য রচয়িতা ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনায় রত খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী মধুসূদন সংস্কৃতও ভাল জানেন না। অথচ এর পরে তিনি বাংলায় সাহিত্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন — তাতে প্রাচ্য

---

৬২. ৬৩নং পত্র।

পাশ্চাত্য ভাবের অভিনব সংমিশ্রন । পাঠক সমাজ হ'ল বিস্ময়াভিভূত । যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে "সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ বা প্রভুত্ব ছিল না । পক্ষান্তরে গ্রীক সাহিত্য বিশেষতঃ হুমর গ্রন্থ তিনি অতি যত্নের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন ।" ৩৩ এ উক্তি পুরোপুরি সত্য নয়, বরং সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য সম্ভারের প্রতি তাঁর বিশেষ পক্ষপাতিত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর রচনার মধ্যে আর চিঠি পত্রে তারই স্বীকৃতি । যিনি ইংরেজি, গ্রীক-ল্যাটিন, ফরাসী, ইটালিয়ান স্প্যানিশ, জার্মান ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন, তামিল তেলেগুকে পর্যন্ত যিনি উপেক্ষা করেন নি, তাঁর সংস্কৃতে অনাগ্রহের কোন যুক্তি থাকতে পারে না । বরং বলা যায় সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্য ও শব্দসংগীত তাঁর মহাকাব্যিক কবিপ্রতিভার বিশেষ অনুকূল ছিল । এ ভাষার শক্তি সম্পর্কে মধুসূদনের ধারণা স্পষ্ট পাওয়া যায় যখন তাঁকে বলতে শুনি সংস্কৃত ভাষার দুহিতা বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন ভাবা যায় না । তবু মধুসূদনের সংস্কৃত শিক্ষায় কিছু ত্রুটি ছিল ।

হিন্দু কলেজের সমসাময়িক সংস্কৃত কলেজে কি ধরণের সংস্কৃত শিক্ষা হত সেটা বিদ্যাসাগরের শিক্ষার ইতিবৃত্ত আলোচনা করলেই জানা যায় । দীর্ঘ প্রায় সাড়ে বারো বছর অধ্যয়নের পরে তিনি কলেজের প্রশংসাপত্র পান । কলেজের দীর্ঘ পাঠ্য-তালিকা দেখলেই বোঝা যায় কি কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা সহকারে সেকালে সংস্কৃত পড়তে হ'ত । মধুসূদনের সে ধরণের কোন শিক্ষা হয় নি । বিশপ্স কলেজে আরও কিছুকাল থাকলে কি হ'ত বলা যায় না । কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপী সুশৃঙ্খল নিয়মাধীন ব্যাকরণচর্চার পাঠাভ্যাস তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভবপর হ'ত মনে হয় না । অস্থির চাঞ্চল্য এবং ধৈর্যের অভাব তাঁর মানসিক গঠনেরই বিশেষত্ব । তাছাড়া সাহিত্য রস-আস্বাদনেই শুধু তাঁর আনন্দ এবং জীবনে বড় কবি হওয়াই ছিল তাঁর চরম লক্ষ্য । কঠোর অধ্যবসায় এবং শুষ্ক জ্ঞান ও বুদ্ধির দীর্ঘ সাধনা তাঁর পক্ষে কখনই সম্ভবপর হত না টোলের সুশৃঙ্খল ভাষাচর্চার বদলে তাঁর হয়েছে আপন মনের আনন্দে রস চর্চা । এর দোষগুণ দুটোই পাই তাঁর নিজের সৃষ্টিতে । "I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves - words

---

৩৩. জীবনচরিত, পৃ. ১৩৪

that I never thought I know. Here is a mystery for you.[৩৪] অন্য পত্রে বলেছেন — The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) inspiration.[৩৫] তাঁর কাব্যানুভূতির এটাই রহস্য। হৃদয়ধর্ম প্রধান আবেগ ও অনুভূতির সার্থক বাণীমূর্তি রচনাতেই তাঁর কবিধর্মের বিশিষ্টতা। এজন্যই বানান বা ব্যাকরণের চেয়ে ভাষার সৌন্দর্য ও বাগ্‌ভঙ্গিমাকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। উৎকৃষ্ট সাহিত্য পাঠই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। I know enough to read Kalidasa, and that I think is quite enough for me.[৩৬]

ভাষার পুঁথি নয়, তার সংগীত এবং রস আস্বাদনই তাঁর কাম্য, নিজের প্রতিভা-বলে তারই চর্চাও করেছেন তিনি। এই অবস্থায় তাঁর বাল্যকালের বাংলাচর্চাও কম সহায়তা করেনি। হিন্দু কলেজ এবং বিশপস্‌ কলেজে যদিও বাংলা তাঁর পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল তবু সেখানে কোন পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে নি। বরং সংস্কৃত কলেজে যদিও বাংলা পড়ানো হ'ত না তবু পণ্ডিতদের কারো কারো মধ্যে মাতৃভাষা প্রীতি থাকার ফলে সেখানে এই পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার — যাঁর কাছে বিদ্যাসাগর দুই বৎসর সংস্কৃত সাহিত্যের পাঠ নিয়েছিলেন, তিনি কলেজে যোগ দেবার পূর্বে দীর্ঘকাল সমাচার-চন্দ্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কৃত্তিবাস কাশীরামদাসের রামায়ণ মহাভারত সংস্কারও করেছিলেন তিনি, আর তাঁর কাছেই বিদ্যাসাগর মাতৃভাষাকে ভালবাসার শিক্ষা এবং সে ভাষার ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে তোলার প্রেরণা লাভ করেছিলেন। তেমন কোন পণ্ডিতের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য মধুসূদন বা হিন্দু কলেজের কোন ছাত্রের ভাগ্যে না ঘটলেও বাল্য কালে স্নেহময়ী মায়ের কাছেই তাঁর মাতৃভাষাকে ভালবাসার দীক্ষালাভ হয়েছিল। জাহ্নবী দেবী কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস কবিকঙ্কন চণ্ডী প্রভৃতি কাব্য মনোযোগ সহকারে পড়তেন। মেধাবী মধুসূদনও আট দশ বৎসর বয়সের মধ্যে জননী ও বাড়ীর অন্যান্য প্রাচীন মহিলাদের এ সব গ্রন্থ পড়ে শোনাতেন ও মাতৃভাষা মাধ্যমে

---

৩৪. ৫৭নং পত্র

৩৫. ৫৬নং পত্র

৩৬. ৬০নং পত্র

মায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণে এগুলি মুখস্থ করতেন । মাদ্রাজে যাবার পরও বন্ধু গৌরদাসকে প্রথম পত্রেই লিখলেন – "...won't you send me a copy of the Bengali translation of the Mahabharut by Casidoss as well as a ditto of the Ramayana,- Serampur edition. I am losing my Bengali faster than I can mention. Won't you oblige me."[৩৭] এই সনে তাঁর একটি ভাষা-সংস্কার জন্মেছিল । বাংলাভাষায় কাব্যচর্চা শুরু করার আগেও তাঁর স্পষ্টই ধারণা ছিল কোন্‌টা বাংলা আর কোন্‌টা বাংলা নয় । বিশপ্‌স্‌ কলেজে পড়বার সময়ে কলেজের উপাসনা কক্ষের প্রার্থনারম্ভিক ভাষণে জগতের অনিত্যতা বোঝাতে জৈনক পাদ্রী সাহেব বলেছিলেন—"অদ্য প্রথম অক্ষ্‌ খেলিলাম, কল্য উঠাইলাম এবং অদ্য খানে অক্ষ্‌ পাড়িলাম ।" কিশোর মধুসূদন এই উপদেশ শুনে হেসেছিলেন, খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ নয়, বাংলাভাষার উপর অত্যাচারে । তাঁর ধর্মান্তর গ্রহণ তো খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ নয়, হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃও নয় । কেবল বিলাত যাওয়ার এবং মহাকবি হবার সুযোগ লাভের জন্য । তাই তিনি ইংরাজিতে বা পুরোপাদিতো চরিতের মত কৃত্রিম ভাষাতে খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ রচনায় কখনই প্রবৃত্ত হন নি । যদিও বিশপ্‌স্‌ কলেজে ছাত্রদের এ পথে চালিত করার চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না ।

বাংলাভাষার স্বাভাবিক রূপ তাঁর জানা ছিল, তারই মধ্যে সংস্কৃত আমদানী করে শক্তিশালী ভাষা গড়ে তোলা যাবে – সেটাই ছিল তাঁর প্রত্যয় ; করেছেনও তাই । নব্য কথ্য রীতিকে তিনি সাহিত্য-বাহন হবার যোগ্য বলে মনে করতেন না – আলালী ভাষা তাঁর মতে জেলেদের ভাষা । সংস্কৃত ভাষা থেকে শব্দ আমদানী এবং সংস্কৃতের উদাত্ত গম্ভীর ধ্বনিসংগীত সঞ্চার না করলে বাংলাভাষা কখনও ধনী হবে না – এই ছিল তাঁর ধারণা । এর সঙ্গে দেশি সংস্কার-প্রীতি ও স্বজাতি-প্রেম মিলিত হয়েই তাঁর হাতে সৃষ্ট হল বাংলার শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য । ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ সম্পর্কে উক্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় –

---

৩৭. ৩৩নং পত্র

"প্রাচীন ভারতের এবং বাংলা কাব্য সাহিত্যের সর্ববিধ পুরাতন সংস্কার তাঁহাতে আসিয়া মিলিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি পুরাতন ভিত্তির উপরেই নূতন সৌধ গড়িতে পারিয়াছিলেন, সর্ব সংস্কার মুক্ত বিদ্রোহী হইলে তাঁহার কীর্তি স্থায়ী রূপ লইত না। মধুসূদন সম্পর্কে সেই কথাটাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে।"[৩৮] এই উক্তিটিকেই চিনে নেবার জন্য বাংলার মনে সংস্কৃত চর্চারও প্রয়োজন ঘটেছে।

প্রথম যৌবনে মধুসূদন বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা দেখালেও চেতনার উদয়ে যখন বঙ্গবাণীর ক্রোড়ে ফিরে এলেন তখন এই পূর্বশিক্ষাকে সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারলেন। শর্মিষ্ঠা, তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, আর বীরাঙ্গনার বেশ কয়েকটি পত্রিকার কাহিনী এসেছে রামায়ণ মহাভারত থেকে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক ভাবে অন্য পুরাণের কাহিনী এসে পড়েছে। সর্বত্র কিন্তু তিনি ব্যাস বাল্মীকিকে অনুসরণ করেন নি। আদি কবিদের কাব্যে নেই – এমন বহু ঘটনা বা বর্ণনা কাশীরাম দাস ও কৃত্তিবাস এই দুই বাঙালী অনুবাদক নিয়ে এসেছেন বিবিধ পুরাণ থেকে, তাঁদের কাব্য তো আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। আর বহু স্থলে তাঁরা নূতন কাহিনী সংযোজন করেছেন অথবা বাঙালী চরিত্রের অনুকূল করে কাহিনীকে রচনা করেছেন। মধুসূদন ব্যাস বাল্মীকির কাহিনী গ্রহণ করেছেন, বহু স্থলে তাদের আক্ষরিক অনুসরণও করেছেন আবার স্থল বিশেষে ব্যাস বাল্মীকিকে ছেড়ে 'শৈশবের মধোদর দাবিদু' কাশীরাম ও কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করেছেন। কাব্যভাষাতেও তাঁদের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

চতুর্দশপদী কবিতারও অনেকগুলির বিষয় বস্তু রামায়ণ মহাভারত বা মঙ্গলকাব্য থেকে নেওয়া। যেখানে কাহিনী সোজাসুজি এগুলি থেকে নেওয়া নয়, সেখানেও উপমা ব্যবহারে বা অনুষঙ্গ ব্যবহারে এগুলি উপস্থিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র সম্পর্কেও সচেতন মধুসূদন অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করলেও (the son of Krishnagar - the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegant genius)[৩৯] ভারতচন্দ্রের কাব্যের শিল্পসৌন্দর্য এবং সুনিপুণতা মধুসূদনকে আকৃষ্ট করে থাকবে। বাংলা সাহিত্য এবং মহাকাব্যের উপাদান ছাড়াও

---

৩৮. সাহিত্যসাধক চরিতমালা, মধুসূদন দত্ত, পৃ. ১১২

৩৯. ৩৬নং পত্র।

সংস্কৃত কাব্য-নাটক থেকেও তিনি বিষয়বস্তু এবং ভাষাসম্পদ আহরণ করেছেন; নাটকের কাব্যোক্তেও সংস্কৃত নাটকের বহুল প্রভাব লক্ষিত হয়। এ ব্যাপারে যেমন তাঁর বঙ্গভাষা-চর্চা থেকে সংস্কৃত-চর্চাকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়, তেমনি কাব্যের প্রাচ্যাদর্শ থেকেও পাশ্চাত্ত্য আদর্শ বিচ্ছিন্ন করা অসাধ্য। এই সব কিছুর সংমিশ্রণেই তাঁর মনোধর্মটি গড়ে উঠেছিল। এই ধরণের পরিমাণ নির্ণয়ের চেষ্টা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করা হবে, তাতে দেখা যাবে যে এগুলি কেবল বহিরঙ্গ আভরণ মাত্র না থেকে কেমন করে অন্তরঙ্গ ভাবনাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

দীর্ঘ আট বৎসর মাদ্রাজে প্রবাস যাপনের পর দেশে প্রত্যাবর্তনের (জানুয়ারী ১৮৫৬) অল্পকাল পরেই মধুসূদনের বাংলা রচনার সূত্রপাত এবং মাত্র চারবৎসরের মধ্যেই শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, দুখানি প্রহসন, তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা, কৃষ্ণকুমারী, বীরাঙ্গনা লেখা হয়ে গেল। ১৮৫৮এর ৩১শে জুলাই বেলগাছিয়ার খ্যাতী রঙ্গশালায় নাট্যকে রামনারায়ণ-অনূদিত রত্নাবলী প্রথমবার অভিনয় হয়। কেবল বাংলা নাট্যসাহিত্যের নয়, সমগ্র বাংলাসাহিত্যেই এই ঘটনার বিশেষ মূল্য এইজন্য যে এই সূত্রেই নবযুগের উদ্গাতা মধুসূদনের সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব। রত্নাবলী ক্রমাগত পর পর বারো বার অভিনীত হয়। প্রথম দু'বার কেবল বাঙালী দর্শকেরাই উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তৃতীয় বার থেকে বহু অবাঙালী এবং গণ্যমান্য ইংরাজেরা আমন্ত্রিত হতেন। তাঁদের বুঝবার সুবিধার জন্য এই নাট্যশালার একজন উদ্যোগী সদস্য মধুসূদনের বাল্যবন্ধু গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মধুসূদন এ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করে দেন এবং স্বয়ং উপস্থিত থেকে অভিনয় দেখেন। একখানি অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য এত অর্থব্যয় দেখে ক্ষুব্ধ মধুসূদন গৌরদাসের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং এই অভাব দূর করতে স্বয়ং চেষ্টিত হবেন এমন প্রস্তাব করেন। সাহেব মধুসূদনের পক্ষে স্পর্ধা প্রকাশই বটে। "এই কথোপকথনের পরেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে তৎকাল প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক আনাইয়া পাঠ করেন ও অতি অল্প দিনের মধ্যেই শর্মিষ্ঠা নাটকের কিয়দংশ রচনা করিয়া গৌরদাসকে দেখাইলে তিনি বিস্মিত হইলেন।"[৪০]

---

৪০. মধুস্মৃতি, ২য় সং, পৃ. ৩১

কি কি বই তিনি এ সময়ে পড়েছিলেন জানতে পারলে বড় ভাল হ'ত । তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারেও নিশ্চয় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ছিল । কিন্তু তিনি নিজের সৃষ্টি ছাড়া আর কোন চিহ্নই রেখে যান নি । অর্থাভাবের জন্য তিনি নিজের এবং স্ত্রীর পোষাক বিক্রি করে দেন, বিদ্যোৎসাহিনী সভা-প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভার উপহার রৌপ্য পান-পাত্র বিক্রি করে দেন, প্রয়োজনে নিজের লাইব্রেরীর বই বিক্রি করে দিতে তিনি দ্বিধা করেন না, নামমাত্র মূল্যে বইয়ের কপিরাইট পর্যন্ত তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন -- তাঁর সম্বন্ধে আজ আর কোন খবর সংগ্রহ করা সহজ নয় । তাঁর নিজের চিঠিপত্র থেকেই তাঁর সাহিত্যরুচি সম্পর্কে এবং কি বই পড়তেন তার সম্বন্ধে যেটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা নিয়েই আজকের অনুসন্ধিৎসুকে তৃপ্ত থাকতে হয় । তবু এটুকু বুঝতে অসুবিধা নেই যে প্রাচীন সাহিত্যের মশাল থেকেই তিনি নিজের কবিতার শিখাটি জ্বালিয়ে নিতে চেয়েছেন । কালিদাস, ভার্জিল এবং টাসো তাঁর মনকে অধিকার করেছিল কারণ সেখানে মহানের সঙ্গে সুন্দরের এবং হৃদয়ের যোগ সাধিত হয়েছে । হোমারে কেবলই দৃশ্য আর মিলটনে কেবলই মহত্ত্ব । He elevates the mind of the readers to a most astonishing height, but never touches the heart.[৪১] কেবল তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে ভ্রমণ করে মন ভরে না, সামুদ্রিক বিস্তারে মন ছাড়া পায় কিন্তু প্রাণ তৃপ্ত হয় না যদিও এগুলি 'noblest objects in creation'. He who is 'beautiful', 'tender' and 'pathetic', with a dash of 'sublimity', is sure to float down the stream of time in triumph[৪২], সংস্কৃত সাহিত্যে এর সন্ধান পেয়েছিলেন বলেই তাঁর মন প্রবলভাবে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল । বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জন্য প্রথম সফল নাটক রচনার প্রাক্ মুহূর্তে তিনি যে কালিদাসের নাটকগুলির কথা মনে রেখেছিলেন তার প্রমাণ মেলে শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতীর কাঠামোতে, তার নানা নাট্য পরিস্থিতি সৃষ্টিতে, ভাষায়, চরিত্র পরিকল্পনায় এবং প্রকৃতি ভাবনায় 'শকুন্তলা'র স্পষ্ট প্রভাব থেকে । তাঁর মানস-

---

৪১. রাজনারায়ণকে লেখা পত্র, ৬১নং

৪২. পূর্ববৎ

প্রবণতা ও অনুশীলনআকাঙ্ক্ষা তাঁকে সংস্কৃত চর্চার দিকে নিয়ে গিয়েছিল, তৎকালীন সংস্কৃত চর্চার ধারাও তাঁকে সাহায্য করে থাকতে পারে। তখনও সংস্কৃতানুবাদের যুগ চলেছে; বাংলায় মৌলিক রচনার যুগ আরম্ভ হয় নি। অনুবাদের মধ্য দিয়েই বাঙালীর রসপিপাসা কিয়ৎ পরিমাণে চরিতার্থ হচ্ছিল। মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্বে অথবা সমকালে বহু সংস্কৃত নাটক কাব্যের যথাযথ অনুবাদ রচিত হয়েছে, আর তার মধ্যে একটা প্রধান অংশই কালিদাসের শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূতের অনুবাদ। এছাড়াও আছে ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার, শ্রীহর্ষের রত্নাবলী প্রভৃতির অনুবাদ। কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি সেই কাজে ব্যাপৃত। এ ছাড়াও কালিদাসের রঘুবংশের, কুমারসম্ভব, বাণভট্টের কাদম্বরী প্রভৃতির অনুবাদ। আর বিদ্যাসাগরের শকুন্তলা, উত্তর রামচরিতের ভাবানুবাদের কথাও ভোলা যায় না। দেশীয় নাটকের আদর্শ কি হবে তা আবিষ্কারের জন্য মধুসূদন এইসব অনুবাদেরই কতকগুলি এবং যে দু'চার খানি মৌলিক নাটক এর পূর্বে লেখা হয়েছে সেগুলিই এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে নিয়ে পড়েছেন — একথা অনুমান করা হয়তো অসঙ্গত নয়। আর কাহিনীর আকর তো তাঁর চিরসঙ্গী রামায়ণ মহাভারত আছেই। পরানুগতিক অকিঞ্চিৎকরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবার জন্য বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তিনি তেমন নূতনত্ব আনবার চেষ্টা করলেন না (কৃষ্ণকুমারী এবং অংশতঃ পদ্মাবতী ছাড়া), পুরাণগুলিতেও পুরাতনের অনুসরণ সম্পূর্ণতঃ বিসর্জনের প্রয়াস দেখা গেল না; পুরাণ কাহিনীকে শুধু রেনেসাঁস-লব্ধ নূতন মূল্যবোধে উপস্থাপিত করলেন — মধুসূদনের মানসপ্রবণতাকে বুঝবার জন্য এই সংবাদটি বিশেষ জরুরী। এই প্রয়োজনেই তাঁর অনলস সংস্কৃত চর্চা। যখন বাংলা কাব্য-নাটক রচনায় আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আছেন, সে সময়কার পত্রাদির মধ্যে যে বারে বারেই সংস্কৃত সাহিত্য এবং ভাষা-শিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন — এটা অর্থহীন নয়।

যে সব পণ্ডিতেরা কালীপ্রসন্ন সিংহকে ঘিরে মহাভারত অনুবাদ করেছিলেন তাঁদেরই মত কেউ কেউ হয়তো মধুসূদনকেও সাহায্য করেছেন। মাদ্রাজ বাস-কালে

যদিও তিনি সংস্কৃত শেখার জন্য অনেকখানি সময় ব্যয় করেছেন, তবু বাংলায় কিছু রচনা করেন নি বলে ভাষা-বিষয়ে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ঘটে থাকতে পারে। তাই রাজনারায়ণের সংশোধন বা পণ্ডিতের সাহায্য প্রয়োজন হয়েছে। তাঁদের সাহায্য তিনি অনর্থক মনে করেন নি। তাই বন্ধু রাজনারায়ণকেও পরামর্শ দিয়েছেন তাঁদের সাহায্য নিতে। If you don't read Sanskrit with ease, get a Pandit to work under your direction.[৪৩] অথচ জানি রাজনারায়ণ বসু সংস্কৃত ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন — উপনিষদের অনুবাদ তার প্রমাণ। মধুসূদনের সময় কম ছিল, ধৈর্যও। তাই একক প্রচেষ্টায় উপর নির্ভর করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ঐ under your direction, নিজের প্রয়োজনানুসারে।

পড়েছেন তিনি প্রচুর, ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস ভবভূতি — বিবিধ পুরাণ। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, মৎস্য পুরাণ — কত জায়গা থেকে কাহিনী নিয়েছেন, তার সূত্র টীকাটিপ্পনী করে দিয়েছেন, এমন কি বহুস্থলে সুস্পষ্ট সার্থক বিশেষণ পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। এতে বোঝা যায় কেবল শোনা গল্পের উপর নির্ভর করেন নি তিনি। অমর কোষ বা সাহিত্যদর্পণও বাদ যায় নি। অমরকোষ যে তাঁর ভালভাবেই পড়া ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় বহু শব্দ ব্যবহারে; বাক্য বাক্যাংশ বা পংক্তি ব্যবহারে অমর কোষের স্পষ্ট অনুসৃতিতে।[৪৪] সাহিত্য দর্পণকারের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তো ছিলই না বরং তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে ছিল বিদ্রোহ —

---

৪৩. ৫৭নং পত্র।

৪৪. অমর কোষ ব্যবহারের প্রমাণ পরে দ্রষ্টব্য। শ্রীরামপুর প্রেসে ছাপা অমর কোষ তখন পাওয়া যেত। ১ জুলাই, ১৮২৫।১৭ আষাঢ়, ১২৩২ তারিখের সমাচার দর্পণে অমরকোষ মুদ্রণের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। —
"পূর্বে কোলব্রুক সাহেব ইংরাজী অর্থের সহিত অমরকোষ গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন সেই গ্রন্থ কালক্রমে দুর্লভ হওয়াতে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় ক্ষুদ্র অক্ষরে ইংরাজী অর্থের সহিত পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে যদি কেহ তাহা লইতে বাসনা করেন তবে দুদশ মুদ্রাতে লইতে পারিবেন।"

I shall not allow myself to be bound by the dicta of Mr Viswanath of the Sahitya Darpan .[৪৫] তবু পরিবর্জনের প্রভাব পড়তে দেখেছি, আর শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতীতে বহুলাংশে তাঁর নাট্যবিধি অনুসরণও করেছেন ।[৪৬] সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের রীতি তো প্রায় সর্বত্র মেনে চলেছেন । ভাবের দিক দিয়ে তিনি প্রাচ্যাদর্শের সঙ্গে প্রতীচ্যের কাব্যকল্পনাকে অনেকাংশে মিলিয়ে দিয়ে অভিনব সাহিত্য রচনা করলেন । অমিত্রাক্ষর ছন্দ সেই ভাবকল্পনারই উপযুক্ত বাহন । কিন্তু অলংকরণায় তিনি প্রাচ্য অলংকার শাস্ত্রকে উপেক্ষা করতে পারলেন না । তাঁর অলংকার-ব্যবহার সংস্কৃতেরই অনুসরণ । যতই তিনি সাহিত্যদর্পণকারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করুন, এবং সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে যাঁরা 'হাঁ ছন্দ হয় নি, উত্তম উত্তম অলংকার আছে' – বলে তাঁর কাব্যের সমালোচনা করেন তাঁদের প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে দেখে থাকুন, তবু সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের রীতিই অনুসরণ করলেন । এর থেকে কি এটাই অনুমিত হয় না যে এসব শাস্ত্রের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ তাঁর ঘটেছিল ? সমকালীন মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও কার্যক্রম পুরোপুরি জানতে পারায় মানুষটিকে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না । বড়ই খেদ থেকে যায় মধুসূদন সম্পর্কে তেমন নিশ্চিতভাবে জানতে না পারায় । তাঁর কবিপ্রতিভার সঙ্গে নানা বিরুদ্ধ প্রবণতার সমাবেশ সে কৌতূহলকে আরও বাড়িয়েই তোলে ।

মধুসূদন তাঁর রচনার বহু স্থানেই সংস্কৃত সাহিত্যের পংক্তি, শব্দ বা শ্লোকের হুবহু অনুসরণ করেছেন । যথাস্থানে আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব । তাঁর কয়েকটি কাব্য নাটকে প্রচ্ছদ পত্রে বা শিরোবাক্যে তিনি যে সংস্কৃত পংক্তি বা শ্লোক উদ্ধার করেছেন এখানে তার উল্লেখ করা যেতে পারে । মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -সংকলিত সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, ১৩৭৭, পৃ. ৭০-এ উদ্ধৃত ।

৪৫. ৫৭নং পত্র ।

৪৬. নাটকগুলি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় এই অনুসরণের পরিমাণ দেখাতে চেষ্টা করেছি ।

এবং নাটকে প্রাচ্য আদর্শকে অনেকাংশে মেনে নিয়ে রচিত তাঁর প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠার প্রচ্ছদ পত্রে তিনি কালিদাসের রঘুবংশের এই পংক্তিটি উদ্ধার করেছিলেন –

মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাং ।

প্রথম কাব্য তিলোত্তমা-সম্ভবে তিনি হোমের ও মিলটনের কাব্য থেকে উদ্ধৃতির সঙ্গে ভবভূতির এই শ্লোকটি শিরোবাক্য রূপে সন্নিবিষ্ট করেছিলেন –

উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী ॥

মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সংস্করণেও প্রচ্ছদপত্রে রঘুবংশের এই দুই পংক্তি মুদ্রিত ছিল –

কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন্ পূর্বসূরিভিঃ ।
মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ ॥

দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে এর পরিবর্তে মধুসূদনের সাহিত্য সেবার মূলমন্ত্র "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্"-সম্বলিত একটি চিহ্ন মুদ্রিত থাকত । মধুসূদনের সব গ্রন্থের সব সংস্করণের প্রচ্ছদপটে এটি থাকত । নীলামে গ্রন্থস্বত্ব বিক্রি করে দেবার পর থেকেই হয়তো বা সেটা আর দেওয়া হয় নি । সমালোচক দীননাথ সান্যালের উক্তি উদ্ধৃত করি –

'বাঙ্গলা সাহিত্য সেবায় তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন । "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম" – হয় শরীর পাতন, না হয় কার্য্য-সাধন, ইহাই তিনি সাহিত্য সেবায় মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহার প্রণীত সকল গ্রন্থের সকল প্রচ্ছদপটে যে একটি সাংকেতিক চিহ্ন মুদ্রিত থাকিত, তাহা ঐ মন্ত্রের দ্যোতক । একদিকে হস্তী, প্রাচ্যের দ্যোতক ; অন্য একদিকে সিংহ প্রতীচ্যের দ্যোতক । উভয়ের মধ্যে (কাব্যপ্রতিভা) রবি নিম্নের (বঙ্গ সাহিত্য) শতদলকে প্রস্ফুটিত করিতেছে । দুঃখের বিষয়, আধুনিক প্রায় সকল সংস্করণেই এই সাংকেতিক চিহ্নটী পরিত্যক্ত হইতেছে । মধুসূদনের গ্রন্থের সহিত উহা চিরমুদ্রিত থাকা উচিত ; কারণ উহাই তাঁহার সাহিত্য সেবায় মূলমন্ত্রের সংকেত ।[৪৭]

---

৪৭. দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত মেঘনাদবধ কাব্য, সন ১৩২৪, পৃ (১০)-(১১) ।

এই প্রচ্ছন্ন ভাব যে সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডার থেকেই আহৃত এবং সে সাহিত্যের রস কবি আকণ্ঠ পান করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই মনে হয়। ছোটবেলায় পড়া কবিকঙ্কণ চণ্ডী ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল বা বাল্যকালের শান্ত পল্লী-পরিবেশ, কপোতাক্ষ নদ, বাঙালী ঘরোয়া জীবন এই প্রচ্ছন্নভাবকেই পুষ্ট করেছে এবং তাঁর কাব্যের সমুদ্রতরঙ্গধ্বনির মধ্যে কখনও বা কোমল করুণ কুলকুলধ্বনি সঞ্চারিত করেছে তবু যে-কবি সমুদ্র এবং পর্বতের দৃশ্যের মধ্যেই নিজের মনোধর্মের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছেন, তিনি যে ক্লাসিকেল সংস্কৃত সাহিত্যের উদাত্ত গম্ভীর শব্দসংগীত এবং বিস্তৃত মহিমময় কল্পনার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হবেন সেটাই তো স্বাভাবিক।

মধুসূদনের সংস্কৃত চর্চা প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন সংগত ভাবেই জাগতে পারে যে তিনি কোন্ কোন্ পুরাণ পড়েছিলেন এবং সেগুলি কেমন করে পেতেন। আজকের দিনে যখন বই যত সহজে পাওয়া সম্ভব, তখন তেমন ছিল না। তাই সেকালে কি ধরণের বই ছাপা হত এবং মধুসূদনের পক্ষে কোন্ কোন্ গ্রন্থ পড়ে থাকা সম্ভব সে বিষয়েও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

বিশপস্ কলেজে কি ধরণের বই পড়ান হত তার কিছু আভাস Adam - এর Report থেকে পাওয়া যায়, তাতে শিক্ষার মধ্যে সেখানে হয়তো কিছু কিছু পাঠ্য পড়ান হত। কিন্তু তারপরেই তিনি সুদূর মাদ্রাজে চলে যান, সেখানে যে তাঁর সংস্কৃত চর্চা অব্যাহত ছিল সেকথা তাঁর চিঠিপত্র থেকেই জানা যায়। কিন্তু কালিদাস, ব্যাস, বাল্মীকি ছাড়া আর কি সংস্কৃত বই পড়তেন, অন্য পুরাণাদি সেখানে তাঁর পাওয়া সম্ভব ছিল কিনা — সেসব বিষয়ে কিছুই আর জানবার উপায় নেই। তবে দেশে প্রত্যাবর্তনের পরে তাঁর পক্ষে কি ধরণের বই পাওয়া সম্ভব ছিল সে বিষয়ে কিছু অনুমান করা চলে তখনকার সংবাদপত্রাদিতে পুস্তক প্রকাশ বিষয়ক খবর থেকে। এ বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' এবং লঙের ক্যাটালগ (১৮৫২) থেকে আমরা কিছু সংবাদ জানতে পারি।

তখন কিছু কিছু পুরাণাদি সংস্কৃত গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হত। মধুসূদনের পক্ষে সেগুলি পড়া অসম্ভব ছিল না।

২ ফেব্রুয়ারী, ১৮২২, ২১ মাঘ ১২২৮-এর খবরে জানা যায় অমরকোষ ইংরাজি অর্থ সমেত ছাপা হচ্ছে,[48] পরে আবার ১ জুলাই ১৮২৫, ১৭ আষাঢ় ১২৩২-এর সংবাদে দেখি, তা পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে[49]। — মধুসূদন যে অমর কোষের সহায়তা গ্রহণ করতেন তার বহু প্রমাণ আছে তাঁর শব্দ ও অলংকার ব্যবহারের মধ্যে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মেঘনাদবধ কাব্যে কর্ণের বিশেষণ আছে 'কালপৃষ্ঠধারী' (১।১৮৭)। কর্ণের ধনুকের নাম যে 'কালপৃষ্ঠ' সেকথা মহাভারতে নেই, কিন্তু অমরকোষে 'কর্ণস্য কালপৃষ্ঠং শরাসনম্'। বেণীসংহার নাটকেও এর উল্লেখ আছে।

তখনকার সংস্কৃতানুবাদ বেশির ভাগই স্মৃতি ব্যাকরণ ও ধর্মাচরণ সংক্রান্ত। সেগুলি সম্বন্ধে মধুসূদনের আগ্রহ থাকার কথা নয়। তবে পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের অনুবাদ ও প্রকাশের সংবাদ আবিষ্কার পাওয়া যায়।[50] তাছাড়া ভাগবতের দশম স্কন্ধ এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর ভাষানুবাদ হয়েছিল।[51] ১২ আগষ্ট, ১৮২১, ৭ ভাদ্র ১২২৮-এর সংবাদ পূর্ণিমায় দেখা। শ্রীযুক্তাশুতোষাদি প্রভৃতি পুরাণোপপুরাণ ও বৈষ্ণব শাস্ত্রাদির গ্রন্থ অধ্যয়ন কমে যাওয়াতে পণ্ডিতেরা জনবদুর্গামন্দ প্রভৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশ ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে গ্রন্থ রচনা করবেন। "ইদানী এদেশের পরোপকারক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহাশয়েরা শ্রীভগবদ্গীতা হিতোপদেশ যোগবাশিষ্ট আনন্দলহরী মার্কণ্ডেয়পুরাণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণাদি নানা গ্রন্থ সংস্কৃত মূল

৪৮, ৪৯. সংবাদ পত্রে সেকালের কথা - পৃ. ৬৪-৭০। এ গ্রন্থে উদ্ধৃত সংবাদগুলি সমাচার দর্পণ থেকে সংগৃহীত। পৃ. সংখ্যা সর্বত্রই উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, চৈত্র ১৩৭৭, থেকে দেওয়া।

৫০. তদেব, পৃ. ৭১, ৭৩

৫১. তদেব, পৃ. ৭৩

রাখিয়া তদীয়ার্থ ভাষা করিয়া যত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন তাহা আমরা সকল অদ্যাপি অবগত হইতে পারি নাই।"[৫২] ভাগবত, চণ্ডী ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বিশেষ জনপ্রিয় ছিল বোঝা যায় এবং এই তিনটি পুরাণকে মধুসূদন বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছেন সেকথা আমাদের কাব্য-সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা থেকে বোঝা যাবে। প্রসঙ্গতঃ আমরা অধিক বহু পুরাণেরই উল্লেখ করেছি – সেগুলি মধুসূদন পড়েছিলেন কিনা জোর করে বলা যায় না, সেগুলির বিষয় এই তিনখানি পুরাণ এবং বিষ্ণুপুরাণে বিধৃত আছে, তাই এগুলি থেকে নিয়ে থাকাই সম্ভাবিত। আবার নানা পৌরাণিক কাহিনী কালিদাসের কাব্যের মধ্যেও আছে কবি সেখান থেকেও নিয়ে থাকতে পারেন। আলোচনা কালে অবশ্য আমরা প্রসঙ্গগুলি কোন্ কোন্ পুরাণে পাওয়া যায় তার যতদূর সম্ভব উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছি। বলাই বাহুল্য বহু অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে তার মধ্যে। বর্ণবৈচিত্র্য, ঘটনার প্রাচুর্য বর্ণনা, বিচিত্র বাক্প্রতিমার আকর রূপে এই পুরাণগুলি এবং কালিদাসের কাব্য মধুসূদনকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছে মনে হয়। এছাড়া রামায়ণ মহাভারত তো আছেই। বহু পৌরাণিক কাহিনী এই দুই মহাকাব্যে পাওয়া যায় – কোথাও একই ভাবে, কোথাও বা খানিকটা পরিবর্তিত আকারে। এই কয়খানি গ্রন্থ থেকেই মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্যের উপাদান অনুগৃহীত হয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

বিষ্ণুপুরাণ যে মধুসূদন পড়েছিলেন তা মনে করার বিশেষ কারণ আছে। তাঁর ব্যবহৃত বহু কাহিনীই বিষ্ণুপুরাণে আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে তিনি বই নিয়ে পড়তেন, সেকথা জীবনীকারেরা উল্লেখ করেছেন। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট Horace Hayman Wilson-এর Vishnu Purana - A System of Hindu Mythology and Tradition - - - লণ্ডন থেকে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইখানি অবশ্যই সোসাইটিতে জমা হয়ে থাকবে এবং মধুসূদনের সেটি পড়ে থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। ভাগবত এবং হরিবংশে বিস্তারিত ভাবে আছে এমন বহু কাহিনীই প্রাচীনতর পুরাণ বিষ্ণুপুরাণে সংক্ষেপে পাওয়া যায়।

---

৫২. তদেব, পৃ. ৬১

মধুসূদন ধর্মাচরণের জন্য পুরাণ পাঠ করেন নি, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গল্পরসই তাঁর উদ্দিষ্ট। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিষ্ণু-পুরাণের (3rd Ed, Introduction by Dr. R. C. Hazra Publisher's note -এ বলা হয়েছে —

What are these Puranas ? They are legends and annals of ancient times, as well as allegories and stories seeking to present the deeper truths of Indian religion in a popular garb, and more easily intelligible form, to people who cannot grasp them in their own native glory and pristine purity.

এই বক্তব্যের শেষাংশ না হলেও পুরাণের আকর্ষণেই — অর্থাৎ 'Grand mythology' — মুগ্ধ হয়ে তার সাহায্যে নিজ ভাবকল্পনার প্রকাশের বাসনাতেই কবি পুরাণ-সংহিতা পাঠ করেছিলেন।

তাঁর পক্ষে সমকালে মুদ্রিত ব্রহ্মবৈবর্ত ও স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে শিবের সহস্র-নাম, শিবপুরাণে শিবের সহস্র নাম বা অন্যান্য পুরাণাদির মত পৃথক-প্রকাশিত গঙ্গাস্তুতি, কাশীর সহস্র নাম, বিষ্ণুর সহস্র নাম, রাধিকার সহস্র নাম[৫৩] প্রভৃতিও মধুসূদন পড়ে থাকা অসম্ভব নয়।

এই সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলা মহাভারত ও রামায়ণ প্রকাশের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। চন্দ্রিকা যন্ত্রালয়ে সংস্কৃত মহাভারত ছাপার সংবাদ সমাচার দর্পণে প্রকাশ হয়েছিল ৭ নবেম্বর, ১৮২১, ২৩ কার্তিক ১২২৮ তারিখে।[৫৪] বাল্মীকি রামায়ণের সংবাদ পাওয়া না গেলেও কোনও প্রেস থেকে তাও ছাপা হয়েছে অনুমান করা যায়। দক্ষিণ ভারতেও এই সংস্কৃত মহাকাব্যদ্বয়ের মুদ্রণ হয়ে থাকা সম্ভব। এ ছাড়াও ভগবদ্গীতা, নলদময়ন্তী, আদিপর্ব, সভাপর্ব প্রভৃতি বিভিন্ন

---

৫৩. তদেব, পৃ. ৬৮

৫৪. তদেব, পৃ. ৮২

প্রেস থেকে ছাপা হবার সংবাদ কয়েকবারই পাওয়া যায়। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে 'পণ্ডিত কর্তৃক সংশোধিত' কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত ছাপানোর খবর সমাচার দর্পণে একাধিকবার বেরিয়েছে।[৫৫] মধুসূদন যে শ্রীরামপুর সংস্করণ বাংলা রামায়ণ মহাভারত পাঠ করেছিলেন সে কথা জানা যায় তাঁর পত্র থেকেই।[৫৬]

বহুপঠনশীল কবির মনে প্রতীচ্য শ্রেষ্ঠ কাব্য সমূহের প্রভাবের সঙ্গে এদেশের পুরাণ মহাকাব্যের কাহিনী চিত্রকল্প রূপক— এককথায় দেশীয় সংস্কার- মিশে গিয়ে তাঁর কবিমানসের বিশিষ্ট রূপটি গড়ে তুলেছিল। পাশ্চাত্ত্যের অনুকারক নব্যবঙ্গীয় যুবকটি যে এমনভাবে দেশীয় ভাবধারাকে আত্মসাৎ করেছিলেন তা সত্যই পরম বিস্ময়কর। দেশের মাটি থেকে রস আহরণ করেই বিলাতি নাইলাক পদ্ম বিতরণে সকলকে মোহিত করেছে।

---

৫৫. তদেব, পৃ. ৫৪, ৭১

৫৬. ৩৪নং পত্র, মাদ্রাজ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯-তে গৌরদাস বসাককে লেখা।